ইউনিট ৫

জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

ভূমিকা

বৈদিক সভ্যতায় অবক্ষয় দেখা দিতে থাকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। এ সময় ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে এক ধরণের অস্থিরতা ও হতাশা। এ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য ভারতব্যাপী শুরু হয় ধর্ম বিপ্লব। অবশ্য, এটি এমন এক সময় যখন সমগ্র বিশ্বেই ধর্মের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতে নতুন ধর্মীয় ধারণা নিয়ে এলেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। মহাবীরের প্রবর্তিত ধর্মের নাম হলো জৈন ধর্ম, আর গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের নাম হলো বৌদ্ধ ধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বেড়ে যাওয়ায় এই নতুন দুই ধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। অগ্রাহ্য করে বেদের রীতিনীতি ও বৈদিক দেব-দেবীর অস্তিত্ব। বর্জন করা হয় বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পশুবলি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সব ধরণের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। তবে এই দুই ধর্মে বর্ণভেদ না থাকায় এবং পূজা অর্চনা তেমন ব্যয়বহুল না হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হয়।

পাঠ ১

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবের পটভূমি।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন কিভাবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উপনিষদের প্রভাব কিভাবে মানুষকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরীশ্বরবাদী কিছু গোষ্ঠীর উত্থান কিভাবে মানুষকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য আসে। ফলে, সমাজের চোখে ব্রাহ্মণদের চেয়ে ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় ষোলটি বড় রাজ্যে তাদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শাসন ক্ষমতায় চলে আসে তারা। সমাজে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব তাদের পছন্দ হয়নি। অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ফলে, বৈশ্য শ্রেণীর মানুষেরা অর্থশালী হয়ে উঠে। তাই, অর্থের বিচারে দরিদ্র ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব মানতে তাদেরও ভাল লাগে না। এসব কারণে সমাজ জীবনে সংঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

কৃষি ও বাণিজ্য বিকাশে, ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় পরিবর্তন

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়। এর বড় কারণ এ সময় কল-কারখানাগুলোতে অনেক ধরণের কৃষি উপকরণ তৈরি হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ভারতের বাইরে অনেক দেশে এ যুগে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন শহর। শহরে বসতি স্থাপন করে বিভিন্ন পেশার লোক। তারা গড়ে তোলে নানা ধরণের সংঘ। কৃষি ও বাণিজ্যের বিকাশ গ্রামীণ কৃষি

সামজে পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে ধর্ম ও দর্শন চিন্তায়। নতুন অর্থনৈতিক অবস্থা প্রচলিত বৈদিক ধর্মের ও সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। এই প্রেক্ষাপট জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সৃষ্টির পথ তৈরি করে।

উপনিষদের প্রভাব

আপনারা ইউনিট- ৪ এ জেনেছেন যে, উপনিষদ এক ধরণের দার্শনিক গ্রন্থ। উপনিষদ জীবনের মূল সমস্যাগুলো সম্পর্কে মানুষকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। তাই বৈদিক ধর্মের কঠিন নিয়ম কানুনের বাঁধন মানুষ মেনে নিতে পারেনি। বৈদিক ধর্ম ছিল নানা ক্রিয়াকলাপ ও যাগযজ্ঞের বিধানে পূর্ণ। উপনিষদের প্রভাবে মানুষ ধীরে ধীরে এসব অনুষ্ঠানকে অযৌক্তিক মনে করতে থাকে। আপনারা ইউনিট- ৪ এর পাঠ- ৯ এ জেনেছেন, পরবর্তী বৈদিক যুগে চতুরাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথার ফলে অনেক মানুষ সাত্ত্বিক ও সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতো। এইসব তপস্বীদের জীবনযাপন ছিল সরল। তাঁদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাসের ভিতটি দুর্বল হয়ে পড়ে। বণিক, কারিগর ও অন্যান্য পেশার মানুষেরা আর বৈদিক ধর্ম ও যাগযজ্ঞের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। তারা ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ দেবতাদের বদলে একটি সরল ধর্ম খোঁজার চেষ্টা করে। এভাবেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

আজীবক শ্রেণীর প্রভাব

বৈদিক ধর্মের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় এক সময় 'আজীবক' নামে নিরীশ্বরবাদী এক সম্প্রদায় বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা করতে থাকে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম 'গোসল মসকরিপুত্র'। এক সময় জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের সাথে তিনি ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। সম্ভবত তিনি ৪৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কোন এক নীচু বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে জৈন ও বৌদ্ধ সূত্রগুলো থেকে জানা যায়। আজীবক দার্শনিকগণ যে মতবাদ প্রচার করেন তাকে বলা হয় 'নিমিত্তবাদ'। তাঁরা মনে করেন পৃথিবীর সবকিছুই আগে থেকে ঠিক করা আছে। ভাগ্য মানুষকে চালিত করে। সুতরাং, ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

জড়বাদীদের প্রভাব

একই সময়ে আরও কতিপয় নিরীশ্বরবাদী গোত্রের উত্থান ঘটে। এসব গোত্রের ধর্মগুরুদের মধ্যে যাঁর নাম অগ্রগণ্য তিনি হলেন চার্বাক। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা জড়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মৃত্যুর পরে যে আবার জীবন আছে এই বিশ্বাস তাঁদের ছিল না। তাই চার্বাকের দর্শন পৃথিবীর যাবতীয় সুখ খুঁজে বেড়ানোর জন্য উৎসাহ দেয়। ফলে, ব্রাহ্মণদের আচার অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞকে জড়বাদীরা অর্থহীন উৎস হিসেবে মনে করে। এ কারণেই চার্বাক অনুসারীদের উপর ক্ষুব্ধ হয় ব্রাহ্মণরা। ব্রাহ্মণদের বিশ্বাস মতে, সংস্কৃত হচ্ছে দেবতাদের ভাষা। এ ভাষায় তাঁরা ধর্মগ্রন্থ লিখতেন। সাধারণ মানুষ স্থানীয় ভাষার চর্চা করতো। স্থানীয় ভাষাকে পবিত্র মনে করতো না ব্রাহ্মণরা। তাই, তারা স্থানীয় ভাষায় ধর্মচর্চাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রাহ্মণদের এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্রমে জনমত তীব্র হতে থাকে। এই অবস্থার ভেতর থেকে দু'টি নতুন ধর্মীয় ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে। এর একটি জৈন ধর্ম, অপরটি বৌদ্ধ ধর্ম।

সার-সংক্ষেপ

পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষদিক থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি মানুষের আস্থা কমে যেতে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসে অনেক পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনায় নতুন ধারণা জন্ম নিতে থাকে। একটি সরল ধর্মের প্রত্যাশা করতে থাকে তারা। এ সময়ের মানুষকে উৎসাহ দেয় উপনিষদের বাণী। উপনিষদ বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দেয়নি। উপনিষদ যে সরল ধর্ম চিন্তার কথা বর্ণনা করেছে তা রূপলাভ করার জন্যই যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটে। নিরীশ্বরবাদী সন্ন্যাসীদেরও পছন্দ ছিল সরল ধর্ম। সমাজজীবনে এই অবস্থা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবকে সাহায্য করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্ষত্রিয়দের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়–
ক. ১২ টি বড় রাজ্যে।
খ. ১৬ টি বড় রাজ্যে।
গ. ১৫ টি বড় রাজ্যে।

২। ভারতের বাইরে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে–
ক. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।
খ. ষষ্ঠ শতাব্দীতে।
গ. খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে।

৩। বৈদিক ধর্মের আচার অনুষ্ঠান অযৌক্তিক মনে হতে থাকে–
ক. বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে।
খ. জৈন ধর্মের প্রভাবে।
গ. উপনিষদের প্রভাবে।

৪। নিমিত্তবাদ প্রচার করে–
ক. বৌদ্ধরা।
খ. ব্রাহ্মণরা।
গ. আজীবক দার্শনিকগণ।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবের পেছনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন কি ভূমিকা রেখেছিল?

২. মানুষ কেন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

পাঠ ২

মহাবীরের জীবনী ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্ম প্রচারক হিসেবে মহাবীরের জীবনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য ও শিক্ষা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মহাবীরের পরিচয়

মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দু'জনেই ছিলেন একই সময়ের। দু'জনের জন্ম ক্ষত্রিয় গোত্রে। দু'জনেই ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নতুন ধর্ম প্রচার করেন। প্রচলিত ধারণা মতে, জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মহাবীর। তবে, জৈনদের বিশ্বাস জৈন ধর্মের অনেক গুরু বা তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীর হলেন শেষ তীর্থঙ্কর। প্রথম তীর্থঙ্কর এর নাম ঋষভদেব বা আদিনাথ। জৈন সাহিত্যে মোট ২৩ জন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে শুধু একজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পণ্ডিতগণের বিচারে বাকিরা হয়তো কাল্পনিক চরিত্র। কাহিনী অনুযায়ী পার্শ্বনাথ বারাণসীর রাজপুত্র ছিলেন। সংসার ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী হন। তিনি অহিংসা, সত্যবাদিতা, পরদ্রব্য হরণ না করা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেন। মহাবীরও ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উত্তর বিহারের বৈশালীর কাছে মহাবীরের জন্ম বলে অনুমান করা হয়। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন গোত্র প্রধান। তাঁর গোত্রের নাম 'জ্ঞাতৃক'। মহাবীরের মাতা ত্রিশলার জন্ম বৈশালীর লিচ্ছবি গোত্রে। মহাবীরের আসল নাম বর্ধমান। রাজকুমার বর্ধমান প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

সন্ন্যাস গ্রহণ

এক সন্তানের জনক বর্ধমান পিতার মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন। পার্শ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত 'নির্গ্রন্থ' নামের এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অনুসারী হন তিনি। বার বছর ধরে তিনি বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে বেড়ান। কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকেন দীর্ঘকাল। ৪২ সৎসর বয়সে তিনি 'দিব্য' জ্ঞান লাভ করেন। বর্ধমানের অনুসারীরা তাঁর নতুন নামকরণ করেন মহাবীর। মহাবীরের অনুসারীদের নাম হয় জৈন। দিব্য জ্ঞান লাভের পর মহাবীর আরও ত্রিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। এ সময় তিনি মগধ, অঙ্গ, মিথিলা ও কোশলে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। পার্শ্বনাথের শিক্ষাকেই মহাবীর গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে পার্শ্বনাথের চারটি শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল। মহাবীর এর সাথে আরেকটি শিক্ষা যুক্ত করেন। তা হচ্ছে, 'সর্বদা জিতেন্দ্রীয় হওয়া'। ৭২ বছর বয়সে মহাবীরের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন মগধে রাজগৃহের কাছে পাবা নামের এক ছোট্ট শহরে। অনেক পণ্ডিতের মতে, তাঁর মৃত্যুর তারিখ ৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

দিব্য জ্ঞান লাভের পর মহাবীর আরও ত্রিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন

আত্মা সম্পর্কে ধারণা ঃ উপনিষদের বাণীর সাথে দ্বন্দ্ব

'জৈন' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে 'জিন' শব্দ থেকে। 'জিন' অর্থ বিজেতা। মহাবীরকে মনে করা হতো বিজেতা এবং তাই তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় জৈন ধর্ম। জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল না। জৈন মতে, স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তাঁদের বিশ্বাস জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটি আত্মআছে। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আত্মক পবিত্র করে তোলা। মৃত্যুর পর এই আত্মদেহ থেকে মুক্তি পায় এবং পরম সুখের জগতে বাস করে। উপনিষদের সাথে এখানে একটি দ্বন্দ্ব আছে। উপনিষদের বক্তব্য অনুযায়ী জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আত্মপবিত্র হয়। কিন্তু, জৈন মত অনুযায়ী মানুষ জ্ঞানের সামান্য একটি অংশ মাত্রই অর্জন করতে পারে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- একজন অন্ধ লোক হাতির লেজ স্পর্শ করে বলে হাতি দেখতে দড়ির মতো, অন্যজন শুড় স্পর্শ করে বলে হাতি সাপের মতো। কেউ পা স্পর্শ করে বলে হাতি গাছের গুড়ির মতো। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে- মানুষ সামগ্রিক জ্ঞানের অংশমাত্রের পরিচয় পায়। এ কারণে উপনিষদের বাণীকে ভুল প্রমাণ করে জৈনরা বলতে চায়- জ্ঞানের পথ মানুষকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারে না। জৈনরা বিশ্বাস করে আত্মক পবিত্র করা সম্ভব সুন্দর জীবন

জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল না। জৈন মতে, স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে

জৈনরা বিশ্বাস করে আত্মক পবিত্র করা সম্ভব সুন্দর জীবন পালনের মধ্য দিয়ে

পালনের মধ্য দিয়ে। মহাবীরের ধারণা একজন সন্ন্যাসী কেবল এমন জীবন পালন করতে পারেন। জৈন ধর্মে বড় পাপ হচ্ছে জীবহত্যা। মহাবীরের শিক্ষা অহিংসা, সত্যবাদী হওয়া, অন্যের জিনিস লুট না করা, দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা। তাঁরা মনে করেন, মুক্তি লাভ সম্ভব তিনটি সাধনা দ্বারা। এগুলো হচ্ছে প্রকৃত ভক্তি, যথার্থ জ্ঞান ও সম্যক আচরণ। জৈনরা মনে করে না খেয়ে থেকে, ভাল বস্ত্র পরিধান না করে, দেহকে নির্যাতন করে আত্মা শক্তি বাড়ানো যায়। জৈন মতবাদ ভোগ বিলাসিতার বিরোধী ছিল। জৈনদের অহিংস নীতি বৌদ্ধদের চেয়েও কঠোর ছিল। না জেনে একটি পিঁপড়েকে মারিয়ে গেলেও তারা তা পাপ বলে বিবেচনা করতো। অহিংস নীতি তাদের চিন্তা ও কাজকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করতো। জৈনরা মসলিন কাপড় দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে রাখতো। যাতে নি:শ্বাসের সাথে ভুলক্রমে কোন ক্ষুদ্র কীট দেহে প্রবেশ করে মারা না যেতে পারে।

মহাবীরের শিক্ষা অহিংসা, সত্যবাদী হওয়া, অন্যের জিনিস লুট না করা, দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করা

কালক্রমে জৈনধর্ম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। মূলত:, মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দেয়ায় ব্যবসায়ীরা এই ধর্ম পছন্দ করতে থাকে। উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য লেনদেনের বিষয়ে জৈনরা বেশ দক্ষ হয়ে উঠে। জৈন ব্যবসায়ীরা সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশেও তাদের বাণিজ্য প্রসারিত করে। ব্যাবসায়ীদের মাধ্যমে জৈন ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। জীবহত্যা বিরোধী বলে কৃষি, মৎস্য ও শিকারজীবি সম্প্রদায় জৈন ধর্মকে পছন্দ করেনি।

সার-সংক্ষেপ

জৈন বিশ্বাস মতে, ২৩ তীর্থঙ্কর জৈন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জনকে পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে মনে করেছেন। এই ধর্মগুরুদেরই শেষ পুরুষ মহাবীর। অভিজাত পরিবারে জন্ম হলেও এক সময় সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেন মহাবীর। কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে অবশেষে জ্ঞান লাভ করেন। মহাবীরের মূল শিক্ষা ছিল অহিংসা, সত্যবাদী হওয়া, অন্যের সম্পত্তি হরণ না করা এবং দরিদ্র জীবন-যাপন করা। জীবহত্যা মহাপাপ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এবং ভোগ বিলাসিতা বিরোধী এই ধর্ম কালক্রমে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের জন্ম–
ক. ব্রাহ্মণ গোত্রে।
খ. ক্ষত্রিয় গোত্রে।
গ. বৈশ্য গোত্রে।

২। মহাবীরের প্রকৃত নাম কি?
ক. পার্শ্বনাথ।
খ. সিদ্ধার্থ।
গ. বর্ধমান।

৩। জৈনদের অহিংস নীতি–
ক. বৌদ্ধদের মত ছিল।
খ. বৌদ্ধদের চেয়ে কম ছিল।
গ. বৌদ্ধদের চেয়ে কঠোর ছিল।

৪। মহাবীর মৃত্যুবরণ করেন–
ক. ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
খ. ৫৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
গ. ৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর -এর পরিচয় দিন।
২. জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য ও শিক্ষা কি ছিল?

পাঠ ৩

জৈন ধর্মের বিস্তার, অবদান ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- জৈন ধর্মের বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- জৈন ধর্ম কী অবদান রেখেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জৈন ধর্মের ভেতরে কিভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিস্তার

জৈন ধর্মের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাবীর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটি দল তৈরি করেছিলেন। এই দলে পুরুষ, মহিলা উভয়েরই অবস্থান ছিল। জৈন ধর্ম খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে জৈন ধর্মের বড় রকমের পার্থক্য না থাকায় এই ধর্মের প্রতি মানুষ খুব বেশি আকৃষ্ট হতে পারেনি। মনে করা হয়, মহাবীরের শিষ্য সংখ্যা ছিল ১৪০০০। জৈন ধর্ম সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। কারও কারও মতে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২২-২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) কর্ণাটকে জৈন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সম্রাট নিজেও জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এক পর্যায়ে সিংহাসন ত্যাগ করে কয়েক বছর সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করেছিলেন। তবে এই সত্য প্রমাণ করার মত তথ্য ইতিহাসে নেই। ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উড়িষ্যার কলিঙ্গে জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দে জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা খারবেল। তিনি অন্ধ্র ও মগধ বিজয় করেছিলেন। তাঁর মূল রাজ্য ছিল কলিঙ্গ। খৃস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে জৈন ধর্ম তামিলনাড়ুর দক্ষিণের জেলাগুলোতে প্রসার লাভ করেছিল। পরবর্তী শতকগুলোতে মালব, গুজরাট এবং রাজস্থানেও জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করে। বর্তমানেও এই অঞ্চলগুলোতে জৈন ধর্মের মানুষদের দেখা যায়। তাদের প্রধান পেশা হচ্ছে বাণিজ্য।

জৈন ধর্ম সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে

প্রাকৃত ভাষার উন্নতি ঃ জৈন সাহিত্য

জৈন ধর্ম ব্যাপক বিস্তার না করলেও সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে কিছু প্রভাব রেখেছিল। বর্ণপ্রথা এবং বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের যে কুফল ছিল তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল জৈন ধর্ম। প্রথমদিকে জৈনরা ব্রাহ্মণদের ভাষা সংস্কৃত বর্জন করেছিলেন। জৈনদের ধর্ম প্রচারের ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা। যে ভাষায় জৈনদের ধর্মীয় সাহিত্য লেখা হয়েছিল তাকে বলা হয় 'অর্ধমগধী'। জৈন সাহিত্য সংকলনের কাজ শেষ হয় ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে। জৈনদের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল গুজরাটের বল্লভীতে। জৈনদের কারণেই প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। প্রাকৃত থেকে পরে অনেক আঞ্চলিক ভাষার জন্ম হয়। যেমন- সৌরসেনি ভাষা। সৌরসেনি ভাষা থেকেই জন্ম নিয়েছিল আধুনিক মারাঠী ভাষা। অপভ্রংশ ভাষায় যে প্রাচীন লেখা দেখা যায় তা জৈনদেরই সৃষ্টি। জৈন সাহিত্যের সূচনা মহাবীরের সময়ে। এ সময় মুখে মুখে সাহিত্য প্রচারিত ছিল। জৈন ধর্মের অনুসারী পণ্ডিত ভদ্রবাহু পর্যন্ত জৈন সাহিত্য ছিল তার আদি অবস্থায়। ভদ্রবাহুর মৃত্যুর পর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে একটি বড় জৈন সমাবেশের আয়োজন করা হয় পাটালীপুত্রে। আয়োজন করেন জৈন সন্ন্যাসী স্থূলভদ্র। এই সমাবেশে মহাবীরের নীতিসমূহকে ভাগ করে "দ্বাদশ অঙ্গে" সাজানো হয়। এগুলো লেখা হয় অর্ধমগধী প্রাকৃত ভাষায়। জৈনদের ধর্মীয় সাহিত্যের ভান্ডার ছিল বিশাল। ধর্ম সাহিত্য ছাড়াও জৈনরা উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্য রচনা করেছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রেও তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

জৈনদের ধর্ম প্রচারের ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ঃ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর

জৈনদের ভেতর এক সময় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়; যা ধর্মটিকে অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছিল। প্রথম দ্বন্দ্ব দেখা যায় আজীবক সম্প্রদায়ের সাথে। এই দ্বন্দ্বের একটি কারণ ছিল বর্ধমান যখন কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন তখন 'গোসলমস্করীপুত্র' নামের এক সন্ন্যাসী একটানা ৬ বছর তাঁর সহযোগী হন। এক সময় এই দুই সন্ন্যাসীর মধ্যে মতবিরোধ হয়। 'গোসল' বর্ধমানকে ছেড়ে আজীবক সম্প্রদায় গঠন করেন। এ সময় জৈন সন্ন্যাসীরা অনুগামীদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করেছিলেন। জৈন সূত্র অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বের শেষদিকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল

মহাবীরের মৃত্যুর ২০০ বছর পরে। দুর্ভিক্ষের কারণে জৈনরা মগধ ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ ১২ বছর স্থায়ী হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার প্রসঙ্গে জৈনদের মধ্যে হয়েছিল প্রচন্ড মতভেদ। এতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় জৈনরা। ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল চলে যায় দক্ষিণ ভারতে এবং সেখানে জৈন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। বাকিরা স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে মগধেই থেকে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ শেষে এরা আবার মগধে ফিরে আসে। কিন্তু, স্থানীয় জৈনদের সাথে তাদের মতবিরোধ শুরু হয়। দক্ষিণ ভারত থেকে আসা জৈনরা দাবি করতে থাকেন যে, এই দুর্ভিক্ষের সময়ও তারা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেছেন। তাদের অভিযোগ মগধের জৈনরা ধর্মের নিয়ম থেকে দূরে সরে গিয়েছে। পূর্বে আপনারা পাটলীপুত্রে যে সম্মেলনের কথা জেনেছেন এই মতভেদের কারণেই তা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু, দক্ষিণ ভারতের জৈনরা এই সম্মেলন বর্জন করেন। এ সময় থেকে দক্ষিণ ভারতীয় জৈনদের বলা হতো 'দিগম্বর'। অর্থাৎ উলঙ্গ থেকে তপস্যা করা ছিল এদের ব্রত। ভদ্রবাহু এই মতের সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে মগধের জৈনদের বলা হয় শ্বেতাম্বর। তাদের নেতা স্থূলভদ্র বা স্থলবাহু অনুসারীদের শ্বেতবস্ত্র পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই দুই মতের কারণেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈন সম্প্রদায় দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

সার-সংক্ষেপ

বৈদিক ধর্মের কঠোরতা ও নানা অনাচারে যখন মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখনই তারা জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত জৈন ধর্ম খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। মগধ জৈন ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হলেও এই ধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে জৈন ধর্ম বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত কিছু অভ্যন্ত রীণ নীতির প্রশ্নে জৈন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব ধর্মটিকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মহাবীরের শিষ্য সংখ্যা ছিল–
ক. ১৪,০০০।
খ. ১০,০০০।
গ. ৪,০০০।

২। জৈন ধর্মের প্রভাবে যে ভাষার উন্নতি হয়েছিল তার নাম–
ক. সংস্কৃত ভাষা।
খ. অর্ধমগধী ভাষা।
গ. প্রাকৃত ভাষা।

৩। 'গোসলমস্করীপুত্র' হচ্ছে–
ক. একটি গোত্রের নাম।
খ. একজন সন্ন্যাসীর নাম।
গ. একটি রাজ্যের নাম।

৪। শ্বেতাম্বর জৈনদের নেতা ছিলেন-
ক. মহাবীর।
খ. ভদ্রবাহু।
গ. স্থূলবাহু।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. জৈন ধর্মের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. জৈন ধর্মের অবদানসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. জৈন ধর্মটি কেন দুর্বল হয়ে পড়ে।

পাঠ ৪

বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- কেন গৌতম বুদ্ধ নতুন ধর্মমত প্রচারের চিন্তা করলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্ম সম্বন্ধে গৌতম বুদ্ধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কিভাবে বৌদ্ধরা ধর্ম প্রচার করতেন তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি এই ধর্ম প্রচার শুরু করেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তিনি কিছু বাস্তব উপলব্ধি থেকে এই ধরণের একটি ধর্মবাণী প্রচারের চিন্তা করেছিলেন। মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা দেখে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। একসময় তাঁর ইচ্ছা হলো তিনি দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পৃথিবীর মানুষকে পরিত্রাণ করবেন। তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা থেকে চারটি মূল সত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এগুলোকে প্রচার করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সত্যগুলো হচ্ছে- (ক) সংসার দুঃখময়, (খ) নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ রয়েছে, (গ) দুঃখের অবসান হওয়া উচিত, (ঘ) দুঃখের অবসানের যথার্থ উপায় জানা উচিত। বুদ্ধ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ৮ টি উপায় অবলম্বন করলে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। একে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলো হচ্ছে- (ক) সম্যক দৃষ্টি, (খ) সৎ সঙ্কল্প, (গ) সৎ বাক্য, (ঘ) সৎকর্ম, (ঙ) সৎ জীবন, (চ) সৎ চেষ্টা, (ছ) সৎ স্মৃতি এবং (জ) সম্যক সমাধি। এতে একদিকে যেমন চূড়ান্ত বিলাস করাকে সমর্থন করা হয়নি, অন্যদিকে কঠোর তপস্যা এবং শরীরের নির্যাতনকেও সমর্থন করা হয়নি। মানুষের মুক্তির জন্য বুদ্ধ মনে করেন, মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই ভাল। বৌদ্ধদের ভাষায় এই মুক্তির নাম 'নির্বাণ'। বৌদ্ধ ধর্মে পরম মুক্তির পথ হলো পুনর্জন্মের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাণ লাভ করা। তবে মুক্তির পথে পৌঁছতে গেলে কর্মফলের একটি ভূমিকা থেকে যায়। বৌদ্ধ ধর্মে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এগুলো হচ্ছে- শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। 'শীল' বা নীতিতে হিংসা, মিথ্যা, বিলাস ইত্যাদি পরিহার করতে বলা হয়েছে। 'সমাধি' হচ্ছে ধ্যান আর প্রজ্ঞা হলো বোধি।

গৌতম বুদ্ধের চারটি মূল সত্য ঃ অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ

(ক) সংসার দুঃখময়, (খ) নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ রয়েছে, (গ) দুঃখের অবসান হওয়া উচিত, (ঘ) দুঃখের অবসানের যথার্থ উপায় জানা উচিত

গৌতম বুদ্ধ

পৃথিবী সৃষ্টি ও ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা

বৈদিক ধর্মীয় ধারণার সাথে বৌদ্ধ ধর্মের বেশ পার্থক্য ছিল। আগেই বলা হয়েছে, দেহকে কষ্ট দিয়ে মুক্তি লাভের চেষ্টা বৌদ্ধ ধর্ম সমর্থন করেনি। এই প্রশ্নে মহাবীরের সাথে গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। যদিও গৌতম বুদ্ধ সকল জীবের প্রতি অহিংস নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন তথাপি জৈন ধর্মের মত অহিংস নীতি পালনে অতি কঠোর হওয়ার কথা বলেননি। বুদ্ধ সরাসরি বেদের মাহাত্ম্য অস্বীকার করেন। বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞকে অর্থহীন মনে করেন। জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন বুদ্ধ। বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবী নিজের নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে। একসময় পৃথিবী ছিল পরম শান্তির জায়গা। কিন্তু, মানুষ ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ায় তা দুঃখে পূর্ণ হয়ে যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রসঙ্গে বুদ্ধ কোন কথা বলেননি। তিনি ঈশ্বর নিয়ে ভাবার বদলে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক শক্তি বিকাশে সময় ব্যয় করাকেই জরুরি মনে করেছেন। তিনি নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের মধ্যে তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করেন।

বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবী নিজের নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে

সংঘের সৃষ্টি ও ধর্ম প্রচার

প্রথমদিকে সকল প্রকার ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্ম থেকে বাদ দেয়া হয়। কিন্তু, ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর পূজা প্রথা প্রবেশ করতে থাকে। বৃক্ষ পূজা করা বা সমাধি স্তূপ নির্মাণ এক সময় জনপ্রিয় হতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের নাম 'সংঘ'। বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায় তৈরি হয় এই সংঘের মধ্য দিয়ে। ভিক্ষুদের কাজ ছিল বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করা। ভিক্ষা করে তাদের খাবার যোগাড় করতে হতো। ফলে, ভিক্ষুরা একই সাথে ভিক্ষা সংগ্রহ ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার করতে পারতো। বৌদ্ধদের এই ধর্ম প্রচারের ধরণ ব্রাহ্মণদের একক শিক্ষা দানের প্রথায় আঘাত হানে। বৌদ্ধ ধর্মে যেকোন জাতের মানুষকে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী বানানো যেতো। সমাজের বিভিন্ন স্ত র থেকে এরা আসতো। তাই বলা হয় বৌদ্ধ সমাজে শিক্ষা ছিল সার্বজনীন।

বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার

সংঘের নিয়ম অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে প্রচারিত হওয়ায় গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসারিত হয়েছিল। মগধ, কোশল ও কৌশাম্বীর রাজ পরিবার ছাড়াও অনেক রাজ্যের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর দু'শ বছর পরে বিখ্যাত মৌর্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিয়োজিত প্রচারকরা এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা যেতে পারে যে, অশোকের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বের অনেক অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই বর্তমান শ্রীলঙ্কা, বার্মা, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশে প্রচুর বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী দেখতে পাওয়া যায়।

মগধ, কোশল ও কৌশাম্বীর রাজ পরিবার ছাড়াও অনেক রাজ্যের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল

সার-সংক্ষেপ

গৌতম বুদ্ধ এক বিশেষ চিন্তা থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটান। পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়িত করেছিল। এ দুঃখ কষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। পরে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তা থেকে উদ্ভব হয় নতুন ধর্ম-মতের, যার নাম বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্মের ব্যাপারে সুস্পষ্ট আদেশ নির্দেশ দিয়ে যান গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মে 'নির্বাণ' লাভই পরম প্রাপ্তি। সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হতে থাকে। এভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরেও অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলতে বোঝায়–
   ক. বুদ্ধের মতে দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার কতগুলো উপায়।
   খ. বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম।
   গ. বৌদ্ধ মন্দির।

২। বৌদ্ধ ধর্মে পরম মুক্তিকে বলা হয়–
   ক. শীল।
   খ. সমাধি।
   গ. নির্বাণ।

৩। গৌতম বুদ্ধ–
   ক. এক ঈশ্বরের কথা বলেছেন।
   খ. বহু ঈশ্বরের কথা বলেছেন।
   গ. ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে নীরব থেকেছেন।

৪। বৌদ্ধ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের নাম–
ক. ভিক্ষু।
খ. সংঘ।
গ. প্রজ্ঞা।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. ধর্ম সম্বন্ধে গৌতম বুদ্ধের ধারণা বর্ণনা করুন।
২. বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার সম্পর্কে ধারণা দিন।

পাঠ ৫

গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধ সাহিত্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- গৌতম বুদ্ধের প্রথম জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্ম প্রচারক গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জানতে পারবেন।
- বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

গৌতম বুদ্ধের শৈশব

গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। গৌতমের জন্ম কপিলাবস্তুর নিকট লুম্বিনী গ্রামে। প্রাচীন ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলায় অবস্থিত নেপালের তরাই অঞ্চল এখানে শাক্য নামে এক ক্ষুদ্র গণরাজ্য ছিল। কপিলাবস্তু এই রাজ্যেরই রাজধানী। শাক্যদের রাজা ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন। প্রথমে গৌতমের নাম রাখা হয়েছিল সিদ্ধার্থ। শৈশবকালে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। অল্প বয়সেই গৌতমের বিয়ে হয় গোপা বা যশোধরা নামে এক বালিকার সাথে। তাঁদের ঘরে আসে পুত্র সন্তান। ছেলের নাম রাখা হয় রাহুল। ছোটবেলা থেকেই সংসারে মন ছিল না গৌতমের। আগের পাঠে বলা হয়েছে মানুষের নানা কষ্ট দেখে তিনি দু:খ পান। তাঁর মধ্যে একটি বৈরাগ্যের ভাব জন্ম নেয়। রাজপ্রাসাদের জীবন তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। এক সময় চুপি চুপি ঘর ছাড়েন এবং তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। প্রথমে রাজপুরে দু'জন গুরুর নিকট দর্শন শিক্ষা করেছিলেন। পরে বর্তমান বুদ্ধগয়ার কাছে উরুবিল্ব নামের স্থানে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। একটানা ৬ বছর তিনি ধ্যানমগ্ন থাকেন। কিন্তু এতেও মুক্তির সন্ধান পেলেন না। তিনি আরও গভীর ধ্যানে বসলেন। ৪৯ দিন পরে একটি সত্য আবিষ্কার করলেন। গৌতম প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেন। বুঝতে পারলেন পৃথিবীতে দুঃখ কষ্টের কারণ কী। এভাবে, গৌতম জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। এ জন্যই তাঁকে জ্ঞানী বা বুদ্ধ বলা হয়। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর।

বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন

শাক্যদের রাজা ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন। প্রথমে গৌতমের নাম রাখা হয়েছিল সিদ্ধার্থ

বুদ্ধের মৃত্যু

গৌতম বুদ্ধ তাঁর জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলো সত্যের বাণী প্রচারে ব্যয় করেন। এই প্রচারকার্য শুরু হয় বারাণসী থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে সারানাথের হরিণচড়ার উদ্যানে। এই সারানাথেই পাঁচ জন প্রথম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তী ৪৫ বছর অযোধ্যা, বিহার ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক মানুষ বৌদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বুদ্ধের মৃত্যুর কাহিনী এমন- পাবা শহরে নিম্নবর্ণের এক শিষ্য বুদ্ধকে খাওয়ার দাওয়াত করেছিলেন। সেখানে তাঁকে শূকরের মাংস খাওয়ানো হয়। অতঃপর তিনি আক্রান্ত হন আমাশয় রোগে। রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে যান। একটি শালগাছের নীচে শায়িত অবস্থায় রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধের শেষ বাণী ছিল- 'পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ক্ষয় পাবে। অধ্যবসায়ী হওয়ার চেষ্টা কর।' বুদ্ধের মৃত্যুকে ধর্ম মতে নির্বাণ প্রাপ্তি বলে। গৌতম বুদ্ধ ৮০ বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন। শিষ্যরা তাঁর মৃতদেহ দাহ করে এবং দেহভস্ম বিভিন্ন উপজাতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ও মগধে রাজা অজাতশত্রুকে ভাগ করে দেন। বুদ্ধের মৃত্যুর তারিখ পর্যালোচনা করে এ, এল, ব্যাশাম বলেন, তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৬ অব্দের মধ্যে কোন এক সময় মারা যান। তবে অধিকাংশের মতে, গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর তারিখ ৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়।

শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধের শেষ বাণী ছিল- 'পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ক্ষয় পাবে। অধ্যবসায়ী হওয়ার চেষ্টা কর।'

গৌতম বুদ্ধ ৮০ বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন

বৌদ্ধ সঙ্গীতি

বৌদ্ধ ধর্মের সূত্র থেকে জানা যায়, বুদ্ধের মৃত্যুর পর মগধের রাজধানী রাজগৃহে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এক বড় সভা হয়। প্রধান শিষ্যরা বুদ্ধের উপদেশগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলন করেন। এই সমাবেশ প্রথম 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' নামে খ্যাত। দ্বিতীয় সমাবেশ হয় বুদ্ধের মৃত্যুর একশত বৎসর পর বৈশালী নগরে। এখানে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেখা দেয় মতভেদ। সংঘের নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে থাকে। সম্রাট অশোকের উদ্যোগে পাটলীপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন অনেক বিরুদ্ধ

মতের কঠোর সমালোচনা করে এবং পুরনো নিয়ম কানুনগুলো নতুনভাবে সংস্কার করে। চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন হয় কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের উদ্যোগে। কাশ্মীর অথবা পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্ধরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এটাই শেষ সম্মেলন বা বৌদ্ধ সঙ্গীতি। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো অনেক প্রমাণ সহকারে সংকলন করা হয়।

ত্রিপিটক রচনা

প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পর এক বা দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হলে বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য সঠিকরূপ ধারণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যকে একত্রিতভাবে বলা হয় 'ত্রিপিটক'। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনটি অংশ ছিল। প্রথম অংশের নাম 'বিনয় পিটক' -এখানে বৌদ্ধ ধর্ম সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীদের নিয়মকানুন এবং বৌদ্ধ বিহারগুলো কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সেসব কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের নাম 'সূত্রপিটক'। বুদ্ধের উপদেশগুলো এখানে সংকলিত রয়েছে। তৃতীয় অংশ 'অভিধর্ম পিটক' নামে পরিচিত। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক সূত্রসমূহ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো বৌদ্ধ ধর্মেও দার্শনিকতত্ত্ব বিচার শুরু হয়। ফলে, এ সময় থেকে বৌদ্ধ ধর্মের সরল সহজ ব্যাখ্যা জটিল হতে থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যকে একত্রিতভাবে বলা হয় 'ত্রিপিটক'।

জাতকের কাহিনী

একটি উল্লেযোগ্য বৌদ্ধ সাহিত্য হচ্ছে 'জাতকের' কাহিনী। বুদ্ধের জন্ম ও জন্মান্তর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী পাওয়া যায় এই জাতকে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে জাতকের কাহিনীগুলো রচিত হয়েছিল। সমকালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জাতক থেকে অনেক মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়।

হীনযান ও মহাযান

ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর মতভেদ প্রবেশ করতে থাকে। দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময় যে সব সন্ন্যাসী বৈশালী বা পাটলীপুত্র অঞ্চল থেকে এসেছিলেন তাদের পরিচয় ছিল পূর্বাগত বলে। আর যারা কৌশাম্বী, অবন্তী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসেছিলেন তাদের পরিচয় ছিল 'পশ্চিমাগত' বলে। প্রথম দলকে বলা হয় 'আচরীয়বাদ' আর দ্বিতীয় দলের নাম হয় 'থেরবাদ'। আবার এ দু'টো দল অনেকগুলো উপদলে বিভক্ত হয়। এভাবে নতুন নতুন মতবাদের সৃষ্টি হতে থাকে বৌদ্ধ ধর্মে। কালক্রমে বৌদ্ধরা 'হীনযান' ও 'মহাযান' এ দু'টো সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সার-সংক্ষেপ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবেই মানুষের দুঃখ কষ্ট আর মৃত্যু তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সংসার ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী হন এবং দীর্ঘদিন তপস্যা করে তিনি জ্ঞান লাভ করেন । এভাবেই সূচনা হয় বৌদ্ধ ধর্মের। ক্রমেই বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি হতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম একটি সংগঠনে পরিণত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সৃষ্টি হতে থাকে নানা বৌদ্ধ সাহিত্য। এভাবে, বৌদ্ধ ধর্ম একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়–
ক. ৪৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
খ. ৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
গ. ৫৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

২। গৌতম বুদ্ধ মৃত্যু বরণ করেন–
ক. কপিলাবস্তুর নিকট লুম্বিনী গ্রামে।
খ. কুশীনগরে।
গ. সারনাথে।

৩। 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' হচ্ছে–
ক. বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সম্মেলন।
খ. বৌদ্ধ ধর্ম সঙ্গীতের অনুষ্ঠান।
গ. বৌদ্ধ বিহার।

৪। বুদ্ধের উপদেশগুলো সংকলিত আছে–
ক. বিনয় পিটকে।
খ. সূত্র পিটকে।
গ. অভিধর্ম পিটকে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. কিভাবে গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন?
২. বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা দিন।

পাঠ ৬

বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভারতে বৌদ্ধ ধর্মে কিভাবে অবক্ষয় এসেছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাদৃশ্যের দিকগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

বৌদ্ধ ধর্মে অবক্ষয়

দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের মাটিতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুটা পরিবর্তিত রূপ নিয়ে বাংলা ও বিহারে এই ধর্ম দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকেছিল। এর পরেই ধীরে ধীরে এ দেশ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের এভাবে পতনের কারণ নিয়ে পন্ডিতরা গবেষণা করেছেন। আসলে প্রথমদিকে বৌদ্ধ ধর্মের যে রকম চরিত্র ছিল ক্রমে তা বজায় থাকেনি। এই ধর্মের ভিতর ধীরে ধীরে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রবেশ করতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের খারাপ দিকগুলো প্রভাব বিস্তার করতে থাকে বৌদ্ধ ধর্মে। পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের মুখোমুখি হতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিতর অনেক সংস্কার করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অধিকার মেনে নিতে হয়। একই সাথে বৌদ্ধ ধর্মেও দেখা দেয় নানা দুর্বলতা। গৌতম বুদ্ধ মূর্তি পূজার বিরোধী হলেও প্রথম খ্রিস্টাব্দ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর ব্যাপকভাবে মূর্তি পূজা শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা ব্রাহ্মণদের মতো ভক্তদের কাছ থেকে উপহার নিতে থাকেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রাজার কাছ থেকেও অনেক দান পেতে থাকেন। এভাবে তাদের জীবন বিলাসী হয়ে উঠে এবং এভাবেই বৌদ্ধ মঠগুলোতে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে বৌদ্ধ মঠগুলোর সম্পদের আকর্ষণে আক্রমণকারীরা ছুটে অবস্থার কারণে আসে। তাদের আক্রমণে বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। এই সামগ্রিক বৌদ্ধ ধর্ম দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতভুমি থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

গৌতম বুদ্ধ মূর্তি পূজার বিরোধী হলেও প্রথম খ্রিস্টাব্দ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর ব্যাপকভাবে মূর্তি পূজা শুরু হয়

বৌদ্ধ ধর্ম দারিদ্র্য বিরোধী

ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হলেও ভারতের জনজীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। গৌতম বুদ্ধ ভারতের মানুষের মৌলিক সমস্যা বুঝতে পেরেছিলেন। যখন কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাণিজ্য এবং মুদ্রার ব্যবহার ব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণীকে প্রচুর সম্পদ এনে দিয়েছিল, তখন সমাজে দেখা দিয়েছিল বৈষম্য। এ কারণেই বৌদ্ধ ধর্ম সম্পদ সঞ্চয় না করার পরামর্শ দেয়। বৌদ্ধ ধর্ম দারিদ্র্য পছন্দ করেনি। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য বুদ্ধের উপদেশ ছিল যে, কৃষককে শস্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া হোক, ব্যবসায়ীকে সম্পদ দেয়া হোক এবং মজুরদের দেয়া হোক মজুরি। বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য কিছু আদেশ-নির্দেশ ছিল। শ্রমণদের সাধারণ জীবনযাপন করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম দারিদ্র্য পছন্দ করেনি। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য বুদ্ধের উপদেশ ছিল যে, কৃষককে শস্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া হোক, ব্যবসায়ীকে সম্পদ দেয়া হোক এবং মজুরদের দেয়া হোক মজুরি

পালি ভাষার উন্নতি : শিল্পকলার উন্নয়ন

অহিংসা ও জীবে প্রেমের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বৌদ্ধ ধর্ম দেশে পশুসম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্ম নতুন সচেতনতা জাগাতে পেরেছিল। শিক্ষার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা নতুন ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করে। বৌদ্ধরা সাহিত্য চর্চা করতো পালি ভাষায়। এ কারণে পালি ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছিল। বৌদ্ধ মঠগুলো শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিহারের নালন্দা ও বিক্রমশীলা এবং গুজরাটের বল্লভীর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতে শিল্পকলার উপরেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়েছিল। বুদ্ধের চমৎকার সব মূর্তি তৈরি হতে থাকে। পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হতে থাকে বুদ্ধের জীবনের অনেক কাহিনী।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাদৃশ্য

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দুই ধর্মের প্রচারকরাই ছিলেন ক্ষত্রিয় গোত্রের। তারা ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিলেন। এছাড়াও এই দুই ধর্ম বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং আর্যদের পশুবলি প্রথার বিরোধিতা করে। উভয় ধর্মই সমাজের নিম্ন শ্রেণীর

মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। বৈশ্যরা ধনী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদের গড়া সমাজে তেমন সম্মান পেতো না। শূদ্রদের ভাগে ছিল অত্যাচার আর ঘৃণা। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম যদিও সরাসরি জাতিভেদকে আক্রমণ করেনি, তথাপি এই দুই ধর্ম বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্ণভেদহীন আন্দোলন বলা চলে। এভাবে, সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ নিজের বর্ণ ত্যাগ করে নতুন এক বর্ণহীন গোষ্ঠীতে যোগ দেবার সুযোগ পায়। ব্রাহ্মণদের পূজা অর্চনা ছিল আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পূজা অর্চনা তেমন জাঁকালো ও ব্যয়বহুল ছিল না। তাই সাধারণ মানুষ সহজে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম যদিও সরাসরি জাতিভেদকে আক্রমণ করেনি, তথাপি এই দুই ধর্ম বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিল

যদিও রাজা বা অভিজাতদের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করায় বুদ্ধদেবের আপত্তি ছিল না। তবুও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে ধর্ম প্রচার করা। তাই তিনি ব্রাহ্মণদের সংস্কৃত ভাষার বদলে সাধারণ মানুষের পরিচিত 'মাগধী' ভাষাকে গ্রহণ করেন। পেশাজীবি শ্রেণীর মধ্যে ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষিজীবিগণ প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছু কিছু ব্রাহ্মণও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ক্ষত্রিয়রাও গ্রহণ করতে থাকে। তবে, এই দুই ধর্মে অহিংস নীতি থাকায় যুদ্ধ ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম শহরাঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে কেন্দ্র করেই প্রসার লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের হাতে ছিল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। এই শ্রেণীদ্বয় অন্যসব বর্ণের মানুষের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করতো। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল বণিক সম্প্রদায় এবার পাল্টা জবাব দেয়ার পথ খুঁজে পায়।

সার-সংক্ষেপ

বৌদ্ধ ধর্ম নিজ আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে সরে এলে মানুষের কাছে এর আকর্ষণ কমে যায়। বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা ক্রমেই হয়ে পড়তে থাকেন বিলাসী। বৌদ্ধ মন্দিরের সম্পদের লোভে আঘাত হানে আক্রমণকারীরা। এভাবে, ধীরে ধীরে অবক্ষয় আসে বৌদ্ধ ধর্মে। বৌদ্ধ ধর্ম অবলুপ্ত হলেও এদেশের জনজীবনে, অর্থনীতিতে, সাহিত্যে ও শিল্পকলায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় একই সময় প্রচারিত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই দুই ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তি পূজা শুরু হয়–
   ক. প্রথম খ্রিস্টাব্দ থেকে।
   খ. প্রথম খ্রিস্টপূর্ব থেকে।
   গ. তৃতীয় খ্রিস্টপূর্ব থেকে।

২। বল্লভীর বৌদ্ধ বিহার–
   ক. গুজরাটে অবস্থিত।
   খ. বিহারে অবস্থিত।
   গ. নালন্দায় অবস্থিত।

৩। পশুবলি প্রথা–
   ক. আর্যরা পালন করতো।
   খ. বৌদ্ধরা পালন করতো।
   গ. জৈনরা পালন করতো।

৪। গৌতম বুদ্ধ মূলত: ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছেন–
   ক. ব্রাহ্মণদের মধ্যে।
   খ. নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে।
   গ. ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল আছে বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৫ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. মহাবীরের পরিচয় উল্লেখপূর্বক জৈন ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
২. গৌতম বুদ্ধের জীবনী উল্লেখ করে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৫.১	ঃ	১। খ	২। ক	৩। গ	৪। গ
পাঠ ৫.২	ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ	৪। গ
পাঠ ৫.৩	ঃ	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। গ
পাঠ ৫.৪	ঃ	১। ক	২। গ	৩। গ	৪। খ
পাঠ ৫.৫	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। খ
পাঠ ৫.৬	ঃ	১। ক	২। ক	৩। ক	৪। খ